শিক্ষা সংস্কৃতি নাস্তিকতার সংকট প্রসঙ্গে

প্রভাস ঘোষ

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার সংকট প্রসংগে

প্রভাস ঘোষ

সারা ভারত ডি এস ও'র একাদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আহুত এই সমাবেশে আমি মনে করি সর্বপ্রথম আলোচনা হওয়া দরকার, কোন্ সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসন অবসান হওয়া সত্ত্বেও আবার ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সংগ্রামী সংগঠন ডি এস ও-কে গড়ে তুলতে হয়েছে।

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে প্রথমে দেখা দরকার, ব্রিটিশ যুগে অন্যান্য রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রশ্ন ছাড়াও ছাত্র-সমাজ, শিক্ষাক্ষেত্রে কোন্ কোন্ সমস্যা সমাধানের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানের জন্য মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। দেখা দরকার, ১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের পর সেইসব সমস্যাগুলি কি সমাধান হয়ে গেছে? নাকি সমাধান হতে চলছে – অথবা সমাধানের পরিবর্তে আরও জটিল ও ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদী যুগে আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধানতঃ তিনটি সমস্যা ছিল। প্রথমতঃ সে যুগের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রকৃত জ্ঞান ও শিক্ষার ভিত্তিতে আদর্শ মানুষ ও চরিত্র সৃষ্টির পরিবর্তে নিছক সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রয়োজনে আমলা ও কেরাণী সৃষ্টির জন্য পরিচালিত হচ্ছিল। সেইজন্য প্রথম দাবি উঠেছিল, প্রকৃত মানুষ সৃষ্টির উপযোগী নূতন শিক্ষাব্যবস্থা চাই। এ দাবির যথার্থতা বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ সহ প্রত্যেক মনীষীই বারংবার উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় সমস্যা ছিল, সেই সময়ের প্রচলিত শিক্ষার সুযোগ মুষ্টিমেয় ধনী ও উচ্চ মধ্যবিত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় ছিল একদিকে আমাদের দেশে ব্যাপক জনসাধারণ-শ্রমিক, কৃষক-এর আর্থিক দুর্গতি – যাদের কাছে শিক্ষা ছিল বিলাসিতার নামান্তর। এই গরীব জনসাধারণের অর্থনৈতিক মান উন্নত করতে না পারলে ব্যাপক শিক্ষার প্রসার সম্ভব ছিল না। তাছাড়া নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যে অংশ এত অর্থনৈতিক অসুবিধা সত্ত্বেও শিক্ষা গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসত, শিক্ষার সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয়ভার তাদের শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত। অন্যদিকে প্রয়োজনের তুলনায় স্কুল-কলেজের স্বল্পতাও শিক্ষাক্ষেত্রে আর একটি বাধা হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং দাবি উঠেছিল, জনসাধারণের আর্থিক মান বাড়াতে হবে, শিক্ষার ব্যয় কমাতে হবে, পর্যাপ্ত সংখ্যক স্কুল-কালেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তৃতীয় সমস্যা ছিল, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষাবিদ, ছাত্র ও শিক্ষানুরাগী জনসাধারণের প্রতিনিধিদের পরিবর্তে সরকারি আমলাদের সাহায্যে পরিচালিত হচ্ছিল। সেই জন্য তৃতীয় দাবি উঠেছিল আমলাতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে।

১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা কি দেখতে পাবো? আমরা দেখবো, উপরোক্ত তিনটি সমস্যাই সমাধান হওয়া তো দূরের কথা, কংগ্রেসী শাসনের কল্যাণে দিনের পর দিন আরও জটিল রূপ ধারণ করে শিক্ষাজীবনে আরও চরম সংকট তৈরি করেছে।

প্রথমতঃ প্রকৃত মানুষ তৈরি করার শিক্ষাব্যবস্থার স্বপ্ন আজ ধূলায় লুণ্ঠিত। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রসমাজকে আরও আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তুলছে। একথা বোধ হয় আমাদের ঘোরতর শত্রুরাও অস্বীকার করতে পারবে না। কেন এটা হচ্ছে, সে প্রশ্ন আমি পরে আলোচনা করব।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার সুযোগ ক্রমাগত সম্প্রসারিত হওয়ার পরিবর্তে দিনের পর দিন সংকুচিত করা হচ্ছে। কারণ ভারতবর্ষের প্রচলিত পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই তীব্র বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কোটি কোটি বেকারদের মধ্যে একটি বিরাট অংশ শিক্ষিত। সরকারি হিসাবেই প্রকাশ, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে একমাত্র শহরাঞ্চালেই শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ছিল ১৮ লক্ষ এবং তাদেরই হিসেব অনুযায়ী তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে এই সংখ্যা দাঁড়াবে ২৫ লক্ষে। এই ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত বেকারবাহিনী সরকারের কাছে এক বিপজ্জনক শক্তি হিসাবে দেখা দিয়েছে। অশিক্ষিত বেকারদের, তাদের অযোগ্যতার মিথ্যা অজুহাত মিথ্যা দেখিয়ে অথবা অদৃষ্টবাদ বা কপালতত্ত্ব বুঝিয়ে নিশ্চুপ করানো সম্ভব। কিন্তু শিক্ষিত বেকারদের তা করা কঠিন। সেইজন্য সরকারি কর্তৃপক্ষ দেশে যাতে বাড়তি শিক্ষিত মানুষ তৈরি না হয়, তার জন্য শিক্ষার সুযোগকে সংকুচিত করার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। এটা আমাদের মনগড়া আবিষ্কার নয়। ১৯৫৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত University Grants Commissin এর Chairman সি ডি দেশমুখ লক্ষ্ণৌর এক সভায় খোলাখুলি স্বীকার করেছেন – "We want to restrict education in order to minimize the number of the educated unemployed."

শিক্ষা বিস্তারের জন্য যেখানে প্রয়োজন ছিল জনসাধারণের আর্থিক মান ক্রমাগত উন্নত করা, সেখানে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, জনসাধারণের প্রকৃত আয় দিনের পর দিন ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। যেখানে প্রয়োজন ছিল শিক্ষার ব্যয় ক্রমাগত কমানো, সেখানে শিক্ষার ব্যয় দিনের পর দিন ক্রমাগত বাড়ানো হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা সংকোচন নীতিকে কার্যকরী করার জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষ শিক্ষার ব্যয়ভার বাড়ানোকে প্রথম পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এই উদ্দেশ্যেই তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স এবং একাদশ শ্রেণী স্কুল কোর্স প্রবর্তন করেছে।

শিক্ষা সংকোচন নীতিকে আরো দ্রুত কার্যকরী করার জন্য দ্বিতীয় কর্মপন্থা হিসাবে আসন সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ স্কীম চালু করা হয়েছে। এই স্কীম অনুযায়ী বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে কত ছাত্র ভর্তি হবে, সেটা সরকারই নির্ধারণ করছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রয়োজনে কত কেরণী, টেকনিসিয়ান, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার প্রভৃতি দরকার এবং এদেরকে train up করার জন্য কত শিক্ষক ও অধ্যাপক প্রয়োজন সেই হিসাব অনুযায়ী স্কুলে, কলেজে,

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে দেশে বাড়তি শিক্ষিত মানুষ না থাকে। যেমন কোন কারখানার মালিক কারখানার যে কয়জন trained কারিগর প্রয়োজন, সেই কয়জন apprentice recruit করে। অবশ্য সরকার পক্ষ তাদের এই ঘৃণ্য উদ্দেশ্যকে ঢাকা দেয়ার জন্য শিক্ষার মান উন্নয়নের নামে ভীড় কমানোর অজুহাত দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ভীড় হচ্ছে কেন- ছাত্র-ছাত্রীরা কি সখ করে ভীড় সৃষ্টি করে? নাকি প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত স্কুল কলেজ না থাকার জন্যই ভীড় হয়? ফলে প্রয়োজন হলো, প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রমাগত স্কুল কলেজের সংখ্যা বাড়ানো। কিন্তু কোন ক্রমেই শিক্ষা সংকোচনকারী সরকারকে আসন সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অধীকার দেয়া যায় না।

তৃতীয়তঃ গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিবর্তে শিক্ষাক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক শাসনকে আরও পাকাপোক্ত করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য হলো উপরোক্ত শিক্ষা সংকচোন স্কীমগুলোকে বিনাবাধায় অতিদ্রুত কার্যকর করা। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বরাবরই সরকারি পরিচালনাধীন ছিল। মাধ্যমিক শিক্ষা-আইনের দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকেও পুরোপুরি সরকারি কর্তৃত্বাধীনে আনা হয়েছে। Govt. এবং Govt. Sponsored College গুলি already সরকারি কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে। U.G.C scheme-এর মাধ্যমে বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপরও পরোক্ষভাবে সরকারি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ব্রিটিশ আমল থেকেই relative authority enjoy করতো, নিত্য নতুন bill-এর মাধ্যমে সেগুলোকে curtail করা হচ্ছে। ফলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি, ব্রিটিশ যুগের যে সকল শিক্ষা সমস্যার সমাধানের দাবীতে এদেশের ছাত্র সমাজ একদিন সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানের জন্য দলে দলে কারাবরণ করেছে, গুলিতে ও ফাঁসিকাঠে আত্মাহুতি দিয়েছে, সেই সংগ্রামী ছাত্র সমাজের স্বপ্ন ভারতবর্ষের পুঁজিপতিশ্রেণীর শোষণের স্বার্থে আজ ধূলোয় লুণ্ঠিত। ফলে আজ আমরা কিএই অপূর্ণ স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য নূতন সংগ্রামের দায়িত্ব গ্রহণ করবো, নাকি-শুধুমাত্র নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করবো? আমরা এই সংগ্রামের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। এই নূতন সংগ্রামের প্রয়োজনেই আবার নূতন সংগঠন গড়ে তোলা দরকার। যে সমস্যাগুলোর কথা আমি বললাম, সে সমস্যা গুলো কোন বিশেষ ছাত্রের ব্যক্তিগত সমস্যা নয়। গোটা দেশের ছাত্র সমাজের সমষ্টিগত সমস্যা। এই সমষ্টিগত সমস্যার সমাধানের জন্যই প্রয়োজন সংঘবদ্ধ সচেতন সংগঠন। সেই সংগঠন হিসাবেই আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে সারা ভারত ডি এস ও'কে গড়ে তুলছি।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হচ্ছে আমরা যারা শিক্ষা ও অন্যান্য সমস্যায় জর্জরিত, তারা কিন্তু এই সব সম্পর্কে ভাবতে চাইছি না, শুনতে চাইছি না, কিছু করতে চাইছি না। এর কারণ হচ্ছে স্কুলে, কলেজে সমাজজীবনে সর্বত্র এমন ধরনের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, যাতে আমরা এইসব সমস্যা সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে বা বুঝতে না শিখি। অথচ, এমন একদিন ছিল যখন এদেশে সমাজ সংস্কারে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রাজনৈতিক সংগ্রামে দেশবন্ধু , সুভাষচন্দ্র, ক্ষুদিরাম, সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল এবং বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র, সত্যেন বসুর মতো মনীষী জন্মেছিলেন। শুধু তাই না – সেদিনের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী যে যেক্ষেত্রে থাকুক না কেন,

নিজেদের চরিত্রকে এঁদের মতো করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিল। গ্রামের ছেলেরা কলকাতায় পড়তে আসতো, কখনও রামমোহন, কখনও বিদ্যাসাগর, কখনও বিবেকানন্দ এবং কখনও সুভাষচন্দ্রের বাণী নিয়ে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে, শহর থেকে শহরে ছড়িয়ে পড়তো। এরা যে শুধু চিন্তায় আদর্শ অনুকরণ করতো তাই নয়, পোষাক পরিচ্ছেদেও বিদ্যাসাগরের চটি হতে শুরু করে সুভাষচন্দ্রের চাদর পরার স্টাইলটি পর্যন্ত অনুকরণ করতো। কিন্তু আজ কোথায় এই ধরণের চরিত্র গঠনের সাধনা? আজ আর কোন ছাত্র-ছাত্রী কখনও কোন দুঃস্বপ্নেও চিন্তা করে না যে আমি শরৎচন্দ্রের মতো সাহিত্যিক হব বা সুভাষচন্দ্রের মতো সংগ্রামী যোদ্ধা হব। এটি কেন হচ্ছে? একি সম্পূর্ণ আকস্মিক? শুধু কি তাই? আজ যখন এসকল মনীষীদের জন্ম বা মৃত্যুদিবস উদযাপিত হয়, তখনও সেখানে কোন প্রাণ থাকে না। কারণ এই সকল জন্মদিন মামুলি বক্তৃতা, ফটোতে পুষ্পাঞ্জলি এবং গান বাজনাইতেই শেষ হয়ে যায়। কেউ একবার এঁদের জীবনীকে বা জীবনের আদর্শকে নিজেদের জীবনে রূপায়িত করার কথা ভাবে না। দেশনেতারা যা বলেন তা নিজেরাই বিশ্বাস করেন না এবং জীবনে প্রয়োগ করেন না। অধিকাংশ শ্রোতার বক্তৃতা শোনারও ধৈর্য থাকে না। উদগ্রীব হয়ে বসে থাকে, কখন বক্তৃতার ঝামেলা শেষ হয়ে গান শুরু হবে। কেন এমন হলো? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন প্রতি পদে পদে এই ধরণের প্রতিভা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে, তখন কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি সর্বত্র এই ধরনের মনীষীর সৃষ্টি হয়েছিল এবং শত সহস্র যুবক-যুবতী তাঁদের আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিল। আজ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এটাই তো আশা করা সঙ্গত ছিল যে, সাম্রাজ্যবাদী বাধা অপসারণের পর এই ধরনের প্রতিভা সৃষ্টির দ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হবে এবং দেশবাসী নিজেদের চরিত্র গঠনের মাধ্যমে এঁদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জানাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশের দিকে তাকালে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, '৪৭ সালের পর যত স্বাধীন ভারতবর্ষের আয়ু বৃদ্ধি ঘটেছে এবং স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে যতই তার জয়ঢাক বাজানো হচ্ছে, ততই আমরা নোংরা মার্কিনী ইয়াংকি culture-এর কাছে আত্মসমর্পন করে degradation-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুগের মনীষীদেরও ভূলতে বসেছি। এটা কেন হচ্ছে? যে দেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী যুগে বাধা সত্ত্বেও এত মনীষীর জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে সে দেশ স্বাধীনতা লাভের পর কেন এমন দুর্গতির মুখে দাঁড়িয়েছে? এটা কি সম্পুর্ণ আকস্মিক, এর কি কোন সমাজিক কারণ নেই?

ব্যাপারটা কি এই যে, সর্বশক্তিমান ব্রহ্মা সেদিন বাছাই করা জ্ঞানীগুণীদের এদেশে পাঠিয়েছিলেন, আর আজ আমাদের কপাল দোষে আমরা সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি? ব্যাপারটাকে এভাবে বুঝতে পারলে আর কোন সমস্যা ছিল না। মিটিং-এ আলোচনারও দরকার ছিল না। সবাই সেই সর্বশক্তিমানের কৃপা বর্ষণের জন্য আরাধনায় বসে থাকতে পারতাম। কিন্তু আমরা যারা কিছু কিছু ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান পড়াশুনা করেছি, তারা এইভাবে সমস্যা বুঝতে পারছি না; আর এইখানেই যত সব গোলমাল। সমাজবিজ্ঞান আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, প্রত্যেক চিন্তা এবং চিন্তা নায়কের জন্মের পিছনে সামাজিক কারণ নিহিত থাকে এবং সেই জন্যই ব্রিটিশরা না চাওয়া সত্ত্বেও এবং শত সহস্র প্রতিবন্ধতা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও ব্রিটিশবিরোধী মুক্তি আন্দোলনের যুগে জ্ঞানে বিজ্ঞানে, সাহিত্যে সর্বত্র এই ধরণের মনীষীর জন্ম হয়েছিল। কোন চরিত্রই বড় চরিত্র হয়ে গড়ে উঠতে পারে না, যদি সে চরিত্র নিছক ব্যাক্তিগত ধান্দার ভিত্তিতে গড়ে উঠতে চায়। এদের প্রত্যেকের চরিত্রেই একটি

বৈশিষ্ট্য ছিল "জ্ঞাতসারে অন্যায় করবো না" এবং যে কোন অন্যায় তা সামাজিকই হোক আর পারিবারিকই হোক, তার বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত থাকবো'। এঁরা যে যে field-এ থাকুন না কেন, প্রত্যেকের উদ্দেশ্য এক ছিল-ব্রিটিশ পদানত ভারতবর্ষকে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে, দর্শনে সবদিক দিয়ে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করা। সেই জন্য দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্রের ক্ষেত্রে যেমন দেশপ্রেম সংগ্রামের এবং সর্বস্ব ত্যাগের রূপ নিয়ে এসেছিল, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের কাছে তেমনি সাহিত্য সাধনা এবং জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্রের কছেও বিজ্ঞান চর্চা একই সংগ্রাম ও সাধনার রূপ নিয়ে এসেছিল।

যারা সাহিত্য বা বিজ্ঞানচর্চা করতেন তাঁরাও মনে করতেন, এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম, এতে নাই বা মিলুক কুসংস্কারগ্রস্ত সমাজপতিদের সাদর সম্ভাষণ অথবা অর্থকাঞ্চন! শুধু রাজনৈতিক জীবনেই নয়, একজন বিজ্ঞানের ছাত্রকেও যদি জিজ্ঞাসা করা হত, পড়ছো কেন? জবাবে সে বলতো, 'সাম্রাজ্যবাদীদের মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে আমার দেশকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করার জন্য'। এটাও একটা career কিন্তু এ career সমাজকে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু আজ যদি কোন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কেন পড়ছো'? তার জবাব মিলবে 'ডিগ্রী চাই, তা নাহলে চাকরি বা টাকা মিলবে না'। বেশি পড়া মানে বেশি ডিগ্রী, বেশি ডিগ্রী মানে বেশি টাকা। 'বাঁচতে হলে টাকা দরকার' এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না, কিন্তু টাকা রোজগার করার জন্যই কি বেঁচে থাকা? আর তার জন্য লেখাপড়া করাই জ্ঞানার্জন? যুগ যুগ ধরে প্রকৃতি ও প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে মানুষ যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সৃষ্টি করেছে, মানুষকে ভালবেসে যীশু, গ্যালিলিও, সক্রেটিস, নিউটন, আইনস্টাইন; আমাদের দেশের বুদ্ধ, চৈতন্য, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ এঁরা যে সত্যের সাধনা করে গেছেন, তাকে আমরা জানবো নিছক টাকা রোজগারের জন্য? আমরা কি ঘূণাক্ষরেও চিন্তা করি যে, বিজ্ঞান বইয়ের পঞ্চাশ পৃষ্ঠা পড়ে যে সত্য আমরা জানছি, সে সত্য আবিষ্কারের জন্য মানুষকে অন্তত পঞ্চাশ হাজার বছর লড়াই করতে হয়েছে। কিছ কিছু ছাত্র আজকাল নির্বিকারে বলে বসে,'ওসব নীতি আদর্শের কথা ছাড়ুন, পেট তো দেখতে হবে। ওসব নীতির বুলি আওড়ালে পেট চলবে না'। পেট দেখতে হবে, মানে যেভাবে হোক , নিজেকে বিক্রি করে দিয়ে হোক, নীতি বিসর্জন দিয়ে হোক টাকা রোজগার করতে হবে। তারা কি ভেবে দেখেছে এইভাবে ভাবলে, এই কথা বললে, যে নারী আজ পেটের দায়ে আত্মবিক্রয় করছে তাকে সমালোচনা করা চলে না। কারণ সে-ও তো বলতে পারে যে, তাকেও তো পেট দেখতে হবে। বাঁচতে হলে খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে, একথা ঠিক। কিন্তু যেকোন ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করার জন্যই কি বেঁচে থাকা? নিছক বেঁচে থাকার জন্যই কি বেঁচে থাকা? মানুষের সঙ্গে জন্তুর জীবনের পার্থক্য কি? মানুষের সঙ্গে জন্তুর জীবনের পার্থক্যই তখনই শুরু হয়েছে যখন মানবজীবনে এসেছে সভ্যতা, সংস্কৃতি, এসেছে রুচি সম্মত জীবনের বাঁচার পথ। তাই আমরা দেখি, মানবসভ্যতার যাঁরা শ্রেষ্ঠ সন্তান তাঁরা নীতি ও আদর্শের ঝান্ডা বহন করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু যেকোন ভাবে বেঁচে থাকার জন্য অসম্মানের জীবন গ্রহণ করেননি। তাই আজ তাঁরা মৃত্যুবরণ করেও বেঁচে আছেন, তাঁরা মৃত্যুকে পরাস্ত করেছেন, আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল ও জীবন্ত হয়ে আছেন। জীবনের মূল্যবোধ কি? কি দিয়ে তা নির্ধারিত হবে? ধনসম্পদ দিয়ে নির্ধারিত হবে? ডিগ্রী দিয়ে, সোস্যাল স্ট্যাটাস দিয়ে নির্ধারিত হবে? এই মাপকাঠিতেই কি আমরা ইতিহাসের বড় মানুষের মূল্য নির্ধারণ

করেছি? নিশ্চয়ই তা নয়। এসব কিছুই তাঁদের ছিল না। তাঁদের অনেকেই দিনের পর দিন গাছ তলায় কাটিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা সকলেই অতুল সম্পদের অধিকারী ছিলেন। সেই সম্পদ মনুষ্যত্বের সম্পদ, মহান আদর্শের সম্পদ। সেই সম্পদের অধিকারী ছিলেন অতীত যুগের সমস্ত বড় মানুষেরা, আমাদের দেশের স্বদেশী আন্দোলনের নায়কেরা। সেই সম্পদের অধিকারী মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুঙ ও কমরেড শিবদাস ঘোষ। এসব সম্পদের মূল্য আমরা দেব না, এসব সত্যের কথা আমারা ভাবব না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবো না, অন্যায় দেখে চুপ করে থাকবো, এই কি যথার্থ জীবন সাধনা? আজ অনেকে চিৎকার করছে standard of education fall করছে! কেন fall করছে এটা বের করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে শিক্ষাবিদদের commission বসছে! কিন্তু যত তাদের মিটিং-এর number বাড়ছে, রিপোর্টের পাতা ভারী হচ্ছে, তত তার সাথে তাল রেখে standard of education fall করছে। আসল কারণটা কেউ ধরতে চাইছে না বা পারছে না। সেজন্যই জনসাধারণ কে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রচার করছে ছাত্ররা রাজনীতি করছে বলেই standard of education fall করছে! কিন্তু আমরা জানি প্রতি হাজার ছাত্রের মধ্যে একজনও রাজনীতি করছে না। কিন্তু যেদিন সত্যই সাম্রাজ্যবাদী যুগে ছাত্ররা রাজনীতির চর্চা করত, দরকার হলে কারাবরণ করত, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র দেশের প্রয়োজনে স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ত, বই বিক্রি করে আন্দোলনের fund জোগাতো– সেদিন কিন্তু standard ছিল এবং জ্ঞানে বিজ্ঞানে দিকপালরা জন্মেছিলেন। সেদিন পরীক্ষা দেওয়া না-দেওয়ার একই উদ্দেশ্য ছিল-টাকা রোজগার নয়, দেশের স্বার্থ। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, শিক্ষা গ্রহণ বা জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ছাত্রদের সামনে যদি কোন সামাজিক উদ্দেশ্য না থাকে এবং তার জন্য সংগ্রাম ও ত্যাগের প্রেরণা না থাকে তা হলে নিছক নিজের ব্যক্তিগত লালসাকে চরিতার্থ করার প্রয়োজন নিয়ে কখনও সত্যিকার জ্ঞান অর্জন হতে পারে না। কিন্তু আজ তাই ঘটছে। 'লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে' – এটা এখনকার বাল্য শিক্ষার প্রথম পাঠ। কিন্তু যদি এটা দেখা যেত যে, না পড়লেও টাকা মেলে, তাহলে অনেকেই পড়ত না এবং কেউ কেউ পড়ছেও না। শুধু তাই নয় স্কুল শেষ করে ভালো রেজাল্ট করা ছাত্ররা যখন কি পড়বো ঠিক করতে বসে, তখন তাদের বিচারের সামনে একটাই মাপকাঠি থাকে কোন্ লাইনে গেলে বেশি রোজগার করা যাবে। শিক্ষকতার কাজ একদিন এদেশে পবিত্র কাজ হিসাবে গণ্য করা হতো। কেননা সেটা ছিল দেশের মানুষ তৈরীর কাজ। আজ কিন্তু আর কোন ভাল ছাত্র ওদিকে যেতে চায় না, এক যাদের কোন গতি নেই তারা ছাড়া। 'দূর! ঐ লাইনে আবার টাকা আছে নাকি? এই হচ্ছে শিক্ষকতা সম্বন্ধে এদেশের ভালো রেজাল্ট করা ছাত্রদের উত্তর। এইসব কারণেই একদিন যে দেশে হ্যারিকেনের আলোয় বসে অনেক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনা হয়েছে এবং জ্ঞানী বিজ্ঞানীর জন্ম হয়েছে, আজ হাজার বিদ্যুতের ছটাতেও তা করা সম্ভব হচ্ছে না।

'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' – এটাই এখনকার চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে মুলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বর্তমান শাসকশ্রেণীর আনুকূল্যেই এটা ঘটছে। যেন-তেন প্রকারেণ নিজেরটা গোছাতে হবে, এই মনোভাব নিয়ে কখনো বড় চরিত্র গঠিত হতে পারে না। চরিত্র দুই ধরনের হবে; হয় অন্যায় করবে, অন্যায়ের সাথে আপোস রফা করে নিজেরটা গোছাতে চাইবে: অথবা অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম চালাবে। দ্বিতীয়টা ভুলে গিয়ে আমরা এখন প্রথমটাই চর্চা করছি।

আনন্দও দুই ধরনের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে আনন্দ অথবা অন্যায় করে এবং নোংরা ঘেঁটে ঘেঁটে আনন্দ। প্রত্যেক যুগের মনীষীদের আনন্দের উৎস একটাই – অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জন্য নিরঙ্কুশ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। এটা না করতে পারলে মানুষ অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পন করে নোংরা ঘেঁটে ঘেঁটে আনন্দ খুঁজতে চেষ্টা করে। আজ তাই হচ্ছে।

আজ আমরা এমন একটা সমাজে বাস করছি যেখানে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনটাই uncertain। এই সমাজে সন্তানকে জন্ম দেওয়ার পর বহু মা-বাপই তাদের খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে এমন কোন গ্যারান্টি নেই, কোন ক্রমে বেঁচে গেলে পড়ার সুযোগ মিলবে কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। পড়ার পর চাকুরি মিলবে কিনা তার কোন certainty নেই। চাকুরি মিললে তা টিকবে কিনা তার কোন guarantee নেই। একটানা uncertainty এর ফলে জীবনটা অনেকটা রেসকোর্স-এর player-দের মত দাঁড়িয়ে গেছে। লাগতেও পারে, নাও লাগতে পারে। সেই জন্য রেসকোর্স-এর player-রা যেমন জীবনকে ভুলবার জন্য মদের পিপেয় ডুবে থাকে তেমনি আজকে যুবক-যুবতীদের সুস্থ জীবনের আনন্দের অভাবে অসুস্থ পঙ্কিল আবহাওয়ার মধ্যে ডুবে থাকতে হচ্ছে। যে সমাজ চলছে তাতে সুস্থভাবে বাঁচবার নিশ্চিন্ত সুযোগ নেই। এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে বলে-উচ্ছৃঙ্খলতা হচ্ছে। ফলে নোংরামির মধ্যেই যুবক-যুবতীরা আনন্দের খোরাক খুঁজতে চাইছে। বর্তমান সমাজের যারা কর্ণধার, তারা চায় না যে, এমন কোন মন বা চরিত্র সৃষ্টি হোক যারা বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্রের পথ অনুসরণ করে বর্তমান সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে মরণপন সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। সেজন্য এমনভাবে মানুষের মনকে গড়ে তুলতে চাইছে, যাতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবাই আত্মসর্বস্ব ও ব্যক্তিকেন্দ্রীক হয়ে গড়ে উঠুক। সেই জন্য নেহাৎ বলতে বাধ্য হয় বলেই নেতাজী, বিদ্যাসাগরের পাথরের মূর্তিতে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আহ্বান জানায়। তাও আজ দিনে দিনে কমছে। আবার, সেই পাথরের মূর্তি প্রকৃত শ্রদ্ধা ও চরিত্র অনুশীলনের মাধ্যমে যাতে আমাদের মধ্যে জীবন্ত চরিত্র হয়ে না ওঠে, সেদিকেও তারা সতর্ক। জীবনী পড়, কিন্তু তাকে জীবনে প্রয়োগ করো না। অন্যায় করা শুধু নয়, অন্যায় সহ্য করাও যে অন্যায়-রবীন্দ্রনাথের এই মূল শিক্ষা আজ শুধু পরীক্ষা পাশের প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ব্যাখা লিখে অনেক বেশি বেশি নম্বর পেতে পারে, কিন্তু জীবনে এর কোন প্রয়োগ নেই। আর এইখানেই রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্রের অপমৃত্যু হচ্ছে। ফটোতে মালা দিয়ে কি হবে, যদি না জীবনে সে চরিত্রের কোন মূল্য থাকে? নাই বা দিলাম ছবিতে মালা। এই যে সেদিন অনেক ঘটা করে নেতাজীর মূর্তি স্থাপন করা হলো, এটা কি যথার্থ নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন না political stunt? যারা একদিন প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতাজীকে বাধা দিয়েছে, দেশত্যাগে বাধ্য করেছে, স্বাধীনতার পরও দীর্ঘদিন যারা নেতাজীর প্রতি কোন সম্মান দেখাতে চাইত না, আজ ১৯ বছর পর কেন নেতাজীর প্রতি ভক্তি উথলে উঠল? তার কারণ আজ দেশের চারিদিক অভাব, অনটন, দারিদ্র্যের জ্বালা, মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ–নেতারা শঙ্কিত। তাই শ্লোগান উঠেছে, দেশের জন্য ত্যাগ কর, কষ্ট সহ্য কর। নেতাজী যেমন দেশের জন্য কষ্ট করে গেছেন, আমরাও তেমনি না খেয়ে কষ্ট করে সরকারের ট্যাক্স জুগিয়ে যাই। এইভাবে নেতাজীর প্রতি আমাদের sentiment এ সুড়সুড়ি দিয়ে তাদের কাজ হাসিল করতে চাইছে। অথচ আমরা আনন্দে অস্থির – এইবার বুঝি সত্যিই নেতাজীকে recognize করা হল। একবারও কি বুঝে দেখবার চেষ্টা করেছি, কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নেতারা এসব করেছেন? যেমন নেতারা

আহ্বান জানাচ্ছেন 'দেশের জন্য কষ্ট কর- সোমবার একবেলা উপবাস কর।' কত বড় ত্যাগের কথা মন্ত্রী বলেছেন। আমরা হাততালি দিয়ে উঠছি। খবরের কাগজে প্রচারের ছড়াছড়ি। একবারও প্রশ্ন তুলেছি কি, এই উপবাসী সোমবার প্রতি সপ্তাহের প্রতিদিনের বহু পিতার দীর্ঘনিঃশ্বাসে, বহু মায়ের চোখের জলে এবং বহু ক্ষুধার্ত সন্তানের ক্রন্দনধ্বনিতে কত পরিবারে বার বার ঘুরে আসছে? দিল্লীর প্রাসাদে বসে মন্ত্রীরা তার খোঁজ রাখেন না। এই সব বলছি অতি দুঃখের কথা। কারণ আমরা একবারে মরে গেছি ভেবেই দেশে যা ইচ্ছা তাই চলছে। আত্মসর্বস্বতা আজ সর্বত্রই আমাদের গ্রাস করেছে। সাহিত্যিক কলম ধরে দেশনেতাদের মনস্তুষ্টি করা এবং সস্তা যৌন আনন্দের খোরাক জুগিয়ে টাকা রোজগার করার জন্য! বিজ্ঞানী, শিক্ষক, অধিকাংশ রাজনীতিবিদ সকলেরই একই অবস্থা। নামে হোক, টাকায় হোক, কিভাবে নিজেরটা গোছানো যায়।

জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিও আজ আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের দালালে পরিণত হয়েছে, সেইজন্য ভিয়েতনামে মার্কিনী আক্রমণের বিরুদ্ধে তাদের কলম চলে না, এমন কি ভারতীয় ছাত্রদের Indian dogs বললেও তাদের টনক নড়ে না। মার্কিন ডলারের দাস্যবৃত্তিই আজ তাদের একমাত্র 'স্বাধীন' সাংবাদিকতার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইজন্য সাহিত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞানে আজ আর মহৎ সৃষ্টি হচ্ছে না; অন্যায়ের সাথে আপস করে কোন মহৎ সৃষ্টি হয় না।

এই শুধু আমাদের দেশেই নয়, সমস্ত পুঁজিবাদী দুনিয়াতেই একই অবস্থা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের দাসত্ব মুক্তির জন্য যিনি আমরণ লড়াই চালিয়েছিলেন সেই আব্রাহাম লিঙ্কনের প্রতিমূর্তি আজ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কেননা আজ তার তলায় বসে চলছে কি করে নিগ্রোদের লিনচিং করে হত্যা করা যায়। কি করে নিগ্রো মেয়েদের গায়ে জলন্ত সিগারেট ছুঁড়ে মজা লোটা যায়। এমন চরিত্রের গঠনের সাধনা চলছে Rock'n rool এবং yankee culture-এর মাধ্যমে। "খাও দাও, স্ফুর্তি কর" – এই স্ফুর্তি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করে নয়, কতভাবে নোংরা চটকে স্ফুর্তি করা যায়। সেজন্য অফিস ফেরতা মার্কিন যুবকদের কাছে আর কোন কাজ নেই, সারারাত night club-ball dance মদ গেলার পরও ঘুম আসে না sleeping pill চাই। সমস্ত দেশটা আজ যৌন ব্যাধিতে ভর্তি হয়ে গেছে; এটা আমাদের কথা নয়, ওদেরই কথা – 'nation of sleeping pills and sex diseases' এই ভাবে জাতিকে mechanically না গড়তে পারলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ভিয়েতনামে মানবতার বিরুদ্ধে এরকম বীভৎস আক্রমণে মার্কিন যুবকদের ব্যবহার করতে পারত না।

Europe- এও একই অবস্থা চলছে। Shakespeare, Milton-এর England আর নেই। সেখানেও বিটনিকস, মকার্স এবং রকার্স culture-এর competition হচ্ছে। নোংরামির ক্ষেত্রে কে কত আধুনিক হতে পারে। লিপস্টিক মাখা ইংল্যান্ডেশ্বরী বিটনিক কালচারের উদ্বোধন করছেন! তাই ভিয়েতনামে বর্বর মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিলে যুবক-যুবতীদের বড় একটা দেখা যায় না। তারা তখন sea-beach-এ life enjoy করতে ব্যস্ত, তখন ৯০ বছরের বৃদ্ধ রাসেল প্রগতি ও মানবতার বাণীকে বয়ে নিয়ে চলছেন। এই ইয়াংকি culture আমাদের দেশকেও গ্রাস করছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে, পূজার মণ্ডপে, restaurant-এ সর্বত্র নোংরামির ছড়াছড়ি।

আগে যুবকরা, নদীর ঘাট, restaurant, মাঠে সর্বত্র গল্প করতো, আড্ডা দিত। কিন্তু সেদিনের আলোচনার বিষয় ছিল আলাদা-গান্ধীজির পথ ঠিক, না সুভাষচন্দ্রের পথ ঠিক। সাহিত্যের মাত্রা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ correct না শরৎচন্দ্র correct। সেদিনও কিছু কিছু ছেলেমেয়ে পরস্পরকে ভালোবাসত। কিন্তু content of love ছিল সম্পূর্ণ different। চরিত্রে, আচারে, ব্যবহারে যাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ, সমাজবোধ ফুটে উঠতো তারাই ভালবাসার যোগ্র পাত্র-পাত্রী ছিল। কিন্তু আজ তাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে নোংরা যৌন আলোচনা film star-দের কাহিনী। মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রে content হয়ে দাঁড়িয়েছে কে কত পোষাকে, কথায় ব্যবহারে অশ্লীল নোংরা culture কে, represent করতে পারে।

এখানে আর একটা কথা বলতে চাই। প্রায়ই ছাত্র-যুবকরা ভালবাসা ও যৌনসম্পর্ককে এক করে দেখে। যৌন সম্পর্ক মানেই কি ভালবাসা? যৌনসম্পর্ক তো জন্তু জানোয়ারদের জীবনেও আছে, নিষিদ্ধ পল্লীতেও আছে। সেটা কি ভালবাসার সম্পর্ক? কোথাও যৌনসম্পর্কে ভালবাসা আসে, কোথাও আসে না। যেখানে ভালবাসা আসে সেখানে সৌন্দর্য আছে, যেখানে নেই সেখানে কদর্যতা আছে। যেখানে যৌনসম্পর্কের মধ্যে আদর্শ আছে, মর্যাদা আছে, রুচি-সংস্কৃতি আছে, কর্তব্য আছে, সেখানেই যথার্থ ভালবাসা আছে। সেখানেই ভালবাসা যথার্থ সুন্দর। সেই ভালবাসারই চিত্র আমরা পাই সেক্সপিয়ারের কাব্যে, টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের অমর সাহিত্যে। বার বার পড়ি। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, ভালবাস আর দুর্বলতা এক নয়। অনেকে যেমন বলে, আমার ওর প্রতি একটু weakness এসে গেছে, মানে ভালবাসা এসে গেছে। ভালবাসাই যদি এসেই থাকে, সেটা যদি যথার্থ ভালবাসা হয় তাহলে সেটা দুর্বল করবে কেন? বরঞ্চ সবলই তো করার কথা। আর ভালবাসা শক্তি দেয়নি বরং শক্তি হরণ করেছে, আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি, তার অর্থ হচ্ছে এই ভালবাসার মধ্যে ভালো কিছু নেই, এর মধ্যে কোন আদর্শ নেই, মূল্যবোধ নেই, মর্যাদাবোধ নেই, আছে শুধু বিকৃত দেহসর্বস্বতা যা মানুষকে পশু করে তোলে। জীবনে সুন্দর আছে, অসুন্দর আছে। আমরা সুন্দরকে নেব, আমরা সুন্দরের পূজারী। যা কিছু অসুন্দর, অন্যায়, কুৎসিত গ্লানিময়, তার বিরুদ্ধে যে আদর্শ লড়ছে, যে আন্দোলন লড়ছে সেই আদর্শ, সেই আন্দোলনই তো সুন্দর, আর যাঁদের মধ্যে সে আদর্শ জীবন্ত প্রতিফলিত ও প্রস্ফুটিত তাঁরাই তো যথার্থ সুন্দর। পিতামাতা হিসাবে হোক, পুত্রকন্যা হিসাবে হোক, স্বামী-স্ত্রী হিসাবেই হোক, বন্ধুবান্ধব হিসাবে হোক, তারাই তো ভালবাসার পাত্রপাত্রী। যথার্থ ভালবাসা মানুষকে পেছন থেকে টানে না, সামনের দিকে এগোতে সাহায্য করে, বাঁধে না, জীবনের মহৎ ব্রত পালনে অনুপ্রাণিত করে, সত্যিকারের মুক্তির সন্ধান দেয়। এই ভালবাসাই তো মানুষকে বড় করে, মহৎ করে, এই ভালবাসাইতো মানুষকে মানবিক সম্পদের অধিকারী করে তোলে, এই ভালবাসাই জীবনে কাম্য। আমরা সকলে বড় হতে চাই, তাই এই ভালবাসা পেতে চাই।

আজ ছাত্ররা উচ্ছৃংখল হচ্ছে এটা নেতারাও বলছেন। কিন্তু কারণ দেখাচ্ছেন সত্যকে সম্পূর্ণ গোপন করে। এরা উচ্ছৃংখলতা বলতে রাস্তার মোড়ে মোড়ে শিস দেওয়া, টিটকিরি মারা বা পূজোর মণ্ডপে কোমর দুলিয়ে নাচাকে মনে করেন না। উচ্ছৃংখলতার কারণ কি বলতে গিয়ে এদেরই এক মুখপাত্র প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছেন – 'Students indiscipline is being menifsted

in the form of strikes, demonstration and agaitation.' যে ছাত্র বেতন বৃদ্ধি অন্যায় মনে করে প্রতিবাদ জানায়, যে ছাত্র ক্ষুধার্ত মানুষের উপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে মিছিল করে, যে ছাত্র সকল সামাজিক সুখদুঃখকে নিজের মনে করে, এদের চোখে তারাই উচ্ছৃংখল। কারণ, এদর আন্দালন ওওদর শৃংখলাবদ্ধ শোষণ ও শাসনের ভিত্তিকে কাঁপিয়ে তোলে। সেইজন্যই এটা উচ্ছৃংখলতা। অবশ্য এ অভিযোগ নতুন নয়। প্রত্যেক যুগেই ক্ষমতাসীন শোষক শ্রেণী প্রগতির এই বাণী প্রচারকদের এই অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। যীশু, বুদ্ধ, মুহম্মদ, বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে ক্ষুদিরাম, সুভাষচন্দ্র কেউ এই অভিযোগ থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু সত্যিই কি এ লড়াই উচ্ছৃংলতা? কোন বিশেষ সামাজিক শৃংখলার বিরুদ্ধে কোন সামাজিক শৃংখলা প্রবর্তনের লড়াই উচ্ছৃংখলতা নয়। পুরাতন সামাজিক শৃংখলা যখন সমাজ প্রগতির পায়ে শৃংখল হয়ে দেখা দেয় তখন সেটাই উচ্ছৃংখলতার জন্ম দেয় এবং তখন সেই সামাজিক শৃংখলার বিরুদ্ধে নুতন সামাজিক শৃংখলাবোধ আনায়নের লড়াই-ই প্রগতির লড়াই। আসলে যারা বর্তমান সমাজের ধারক ও বাহক তারাই উচ্ছৃংখলতার জন্ম দিচ্ছে এবং বাঁচিয়ে রাখছে এবং যারা সকল অন্যায় অত্যাচারের উৎস যে বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থা তাকে পরিবর্তনের লড়ছে, তারাই উচ্ছৃংখলতার বিরুদ্ধে লড়ছে।

ছাত্রদের রাজনীতি করা উচিত নয় – এই উপদেশও তারা দিচ্ছেন এবং দুঃখের বিষয় বুদ্ধিজীবী বলে গর্ব করেন এ রকম অনেকেই এ প্রচারে বিভ্রান্ত হয়েছেন। অথচ ছাত্র-ছাত্রী নির্বিশেষে কেউ কি যথার্থ রাজনীতির উর্ধ্বে থাকতে পারেন?

রাজনীতি কি? সমাজব্যবস্থা কিভাবে চলবে তাই রাজনীতি। সমাজবদ্ধ জীবনে বাস করে কি কেউ সমাজব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে? আর বাস করছি তার অর্থই হচ্ছে সমাজব্যবস্থা যারা চালাচ্ছেন তাঁদের নিয়ম মেনে বাস করছি তার অর্থই হচ্ছে সমাজব্যবস্থা যারা চালচ্ছেন তাঁদের নিয়ম মেনে জমিতে, কারখানায় উৎপাদন করছি, অফিস-আদালতে কাজ করছি, নাগরিক হিসাবে তাঁদের দেওয়া অধিকার এবং আইন শৃংখলা মেনে চলছি, তাদের কর দিচ্ছি, তাদের মনোনিত syllabus পড়াচ্ছি অথবা পড়ছি, তারা যেমনভাবে গড়তে চাইছে, তেমনি ভাবেই গড়ে উঠছি। জ্ঞাতসারে হোক, অজ্ঞাত সারেই হোক তাদেরই সৃষ্ট নিয়মকে মেনে নিয়ে সমাজকে চলতে সাহায্য করছি। সক্রিয়ভাবে দলভূক্ত না হলেও এটা কি রাজনীতি করা নয়? আবার সচেতনভাবে এসবের বিরুদ্ধ করে অন্য ব্যবস্থা, নিয়ম শৃংখলা প্রতিষ্ঠার লড়াইও রাজনীতি। অথচ এরা প্রথমটাকে বোঝাতে চাইছে রাজনীতি নয়, দেশ গঠন; আর রাজনীতি হচ্ছে দ্বিতীয়টা। এভাবে তারা 'রাজনীতি ক'রো না' এই উপদেশ দিয়ে বিরোধী রাজনীতিকে মারতে চাইছে এবং নিজেদের রাজনীতিকে বিনা বাধায় কার্যকরী করতে চাইছে। অনেকেই এমন কথা বলে থাকে যে, ছাত্রদের রাজনীতি করা উচিত নয়। কিন্তু আমি বলি ছাত্ররা রাজনীতি করবে কি করবে না এ প্রশ্নটাই ভ্রান্ত। কারণ চাইলেই কি কোন ছাত্র রাজনীতির বাইরে থাকতে পারে? করা, না করা তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে? একটা সমাজ চলছে, তার মানে তার চাষবাস, কলকারখানা, অফিস-আদালত, হাট-বাজার সবকিছুই কোন না কোন নিয়ম মেনে চলছে। এমনকি শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আইন-কানুন, পারিবারিক জীবন এ সবকিছুই কোন না কোন নীতির দ্বারা নির্ধারিত হচ্ছে। আর রাজনীতি এটাকে নির্ধারণ করছে। ফলে যে কেউ সমাজে বাস করে মানুক না মানুক, বুঝুক না বুঝুক মানুষ কোন না কোন

সামাজিক ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক সে রাজনীতির সাথে যুক্ত হচ্ছে। সমাজে যা কিছু হচ্ছে তা মেনে নেওয়াও রাজনীতি। এর বাইরে কিছু থাকতে পারে না। দ্বিতীয়ত ঃ ছাত্রদের শিক্ষাজীবনও রাজনীতির বাইরে নয়। শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে কে? না, সরকার। শিক্ষানীতি কি হবে, কোন ধরণের পাঠ্যক্রম চালু হবে, কাদের জন্য কতটুকু শিক্ষার সুযোগ থাকবে, কোথায় শিক্ষায়তন খোলা হবে, নাকি আদৌ খোলা হবে না- তার সব কিছুই ঠিক করছে সরকার, তার শিক্ষাদপ্তর। আর সরকার মানেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সরকারের শিক্ষানীতিকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়াও যেমন শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে মেনে নেওয়া, তেমনী তার বিরুদ্ধতা করাও একটা রাজনীতি করা। এমনকি জ্ঞানও রাজনীতি মুক্ত নয়। জ্ঞান কি? কোত্থেকে জ্ঞান আসে? জ্ঞান হচ্ছে সামাজিক সংগ্রামের অর্জিত সম্পদ। মানবজাতি সেই সুদূর অতীত থেকে একদিকে প্রকৃতিকে জয় করার জন্য, অন্যদিকে ক্রমাগত সমাজ পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করেছে, আজও করছে, ভবিষ্যতেও করতেও থাকবে। জ্ঞান হচ্ছে এই সংগ্রামেরই সংগৃহিত, সুশৃঙ্খলিত, সুবিন্যস্ত অভিজ্ঞতার ফল। একযুগ সংগ্রাম করে যে জ্ঞানের ভান্ডার রেখে যায় সেই যুগের গর্ভে নবাগত যারা আসে তারা সে জ্ঞানকে হাতিয়ার করে এগিয়ে চলে। আবার তারা তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা জ্ঞানের ভান্ডারে রেখে যায়। একযুগের পরিপ্রেক্ষিতে যা সত্য অন্য যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অকার্যকরী হয়ে যায়। নতুন যুগের নতুন সত্য এসে যায়। ফলে জ্ঞান আসছে সংগ্রাম থেকে। আর জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যও সংগ্রাম। এই অর্থ জ্ঞানার্জনকে সামাজিক সংগ্রাম থেকে অর্থাৎ রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কেউ ভাবতে পারে, আমি নিরপেক্ষ- কিন্তু তাহলে কি নিরপেক্ষ হওয়া যায়? এ হচ্ছে নিছক আত্মপ্রবঞ্চনা। 'আমি কোন কিছুর মধ্যে নেই'-অর্থাৎ আমি ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায় সত্য-মিথ্যা, প্রগতি-প্রতিক্রিয়া কোন কিছুর মধ্যে নেই। তাহলে আমি আছি কোথায়? ভাল বা ন্যায়ের পক্ষে যদি আমি না থাকি ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, মন্দ ও অন্যায়ের সাথ নিশ্চয়ই যুক্ত আছি। কেউ ভাবেন রাজনীতি চরিত্র নষ্ট করে। একথাও কি সবসময় ঠিক? তাহলে এটা কি করে ঘটল যে, সভ্যতার সমস্ত মহান সন্তান, বুদ্ধ,যীশু, মুহম্মদ, মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, আমাদের দেশের স্বদেশী আন্দোলনের যুগের সমস্ত বড় মানুষেরা বিদ্যাসাগর বিবেকানন্দ, নেতাজী, লালা লাজপত সমস্তই সামাজিক সংগ্রামের রাজনৈতিক সংগ্রামের সৃষ্টি? হ্যাঁ রাজনীতি মানুষকে নষ্ট করে, যে রাজনীতি দুষ্ট রাজনীতি, নোংরা রাজনীতি, যে রাজনীতি নীতিহীন, সংস্কৃতি বর্জিত, যে রাজনীতি শোষক শ্রেণীর রাজনীতি-যে মানুষের মনুষ্যত্বকে হত্যা করে। কিন্তু যে রাজনীতি অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়ছে, শোষণমুক্তির জন্য লড়ছে-সে রাজনীতি মানুষকে মনুষ্যত্ব ও চরিত্র দেয়, মানুষকে সাহস ও তেজ যোগায়। ফলে রাজনীতিবিমুখতা নয়। আমাদের ঠিক করে নিতে হবে, আজকের সমাজ অগ্রগতির স্বার্থে-অর্থনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি সমস্ত কিছুর প্রগতির স্বার্থে কোন রাজনীতি গ্রহণ করব?

আমাদের সমাজটা পুঁজিবাদী সমাজ আর আজকের দিনে পুঁজিবাদ সামাজিক স্বার্থের বিরোধী। তাই পুঁজিবাদ আজ সমাজ অগ্রগতিকে রোধ করছে, ব্যক্তিকে সমাজবিরোধী করে তুলছে, ব্যক্তিকেন্দ্রীক ও আত্মসর্বস্ব করে তুলছে, সমানবজীবনে যা কিছু সুন্দর সবকিছুকে নষ্ট করছে। তাই যে জাতি একদিন ব্রিটিশ শাসনের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে রামহোন-বিদ্যাসাগরকে নিয়ে নবপ্রভাতের সূচনা করেছিল, যাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, রাজনীতি-জীবনের সর্বক্ষেত্রে একের পর এক দিকপালরা এসছিলেন, ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর সেই জাতি আজ

অগ্রগতির ক্ষেত্রে শুধু ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়, এতটা অধঃপতিত হয়েছে যে, তার অতীত দিনের এই মহান গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে সম্পূর্ণ বুলে গিয়েছে। আজকের দিনের ছাত্র-যুবকরা রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র এঁদেরকে জানে না। কিন্তু চিত্র তারকাদের নোংরা কুৎসিত কাহিনী তাদের মুখে মুখে। আজ আর কেউ সুভাষচন্দ্র, ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিংদের স্মরণ করে না। সেদিনের যুবক-যুবতীদের কাছে চিন্তা ছিল কি করে পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করবে, কিভাবে মনুষ্যত্বের অধিকারী হবে। কোন পথে গেলে, কার আদর্শ অনুসরণ করলে সত্যিকার বড় হতে পারবে। আর আজ দেশে এত দুঃখ, দুর্দশা লক্ষ লক্ষ শোষিত নর-নারীর আর্তনাদ, ক্ষুধার্ত শিশুর কান্না-কিন্তু কে এদের নিয়ে ভাবছে? কোথায় সে যৌবনের মানসিকতা? আজকের ছাত্র-যুবকেরা নোংরা সিনেমার কাহিনী, কুৎসিত যৌনসাহিত্য, মদ, ড্রাগ, জুয়ার আসরের প্রমত্তায় মত্ত। এমনকি মেয়েরা রাস্তায় ইজ্জৎ নিয়ে চলাফেরা করতে পারেনা তথাকথিত ' শিক্ষিত' ছেলেদের কুসিত আচরণে। কি দেশের আজ কি করুণ পরিনতি!

এসব কথা থেকে এাঁ follow করে না যে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা আমাদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মসর্বস্ব এবং উচ্ছৃংখল করতে চাইছে, আর আমরা সবাই তাই হয়ে যাব। এইভাবে ভাবলে কোন যুগেই সমাজ প্রগতির প্রশ্ন থাকে না। কোন বিশেষ সমাজ অমানুষ করতে চাইলেই কি আমরা অমানুষ হয়ে যাব? আমরা নিজেরা বিচার, বিবেক, বুদ্ধি প্রয়োগ করে যে ষড়যন্ত্র আমাদের তিলে তিলে ধ্বংস ও অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে কি রুখে দাঁড়াবো না? আজকাল একদল মানুষ কিছু ভাবতে চাইছে না, আর একদল তেমনি সব বুঝে বলে, ' আপনারা করুন আমরা আছি ।' এভাবে তারা দুপাশে সরে দাঁড়ায়। তারা একবারও কি ভেবে দেখে, সবাই যদি এভাবে উত্তর দেয় " আপনারা করুন, আমরা আছি' তাহলে করবে কারা? এভাবে যারা ভাবচ্ছে তাদের কাছে প্রশ্ন-তারা কোন্ মধুর জবিনের আকর্ষণে এইভাবে সংগ্রাম থেকে দুরে সরে থাকতে চাইছে? আজ আর সে জীবনে সত্যিই কোন আনন্দ আছে? সংগ্রামের কথা শুনলে আমরা সবাই ভয় পেয়ে যাই। অথচ সত্যিই কি কেউ সংগ্রাম থেকে মুক্ত? নিজের জীবন ও জীবিকার জন্য যারা উদায়স্ত পরিশ্রম করছে বা করতে চাইছে তারা কি সংগ্রাম করছে না? যখন ভাবি সংগ্রাম করব না তখন আসলে সমাজ প্রগতির সংগ্রামকে avoid করতে চাইছি। কিন্তু সেই আমাকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে জীবন রক্ষার তাগিদে। কিন্তু তাতে কি ফল ফলছে? যাঁরা আজ বৃদ্ধ তাঁদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায় আজীবন তো উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু তাতে কি কোন আনন্দ কিংবা সুখ পেয়েছেন? দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে একটাই উত্তর দেবেন, 'না'। তেমনি যে সকল যুবক-যুবতী তাদের নিশ্চিন্ত জীবন গড়ে তোলার জন্য সমাজ প্রগতির সংগ্রাম থেকে সরে থাকতে চাইছে, বিশ পঁচিশ বছর বাদে তাদেরও গাল ভাঙা, চক্ষু কোটরাগত মুখচ্ছবির মধ্যে বৃদ্ধদের এই হতাশাই ফুটে উঠবে।

পারিবারিক দায়িত্বের কথা ভেবেও আজ যারা পিছু হটতে চাইছে, তাদেরও দেখা দরকার বর্তমান সমাজব্যবস্থা পারিবারিক জীবনকেও আজ কোথায় ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। আজকে সমাজজীবনে যার টাকা সেই সমাজের মালিক। পাড়াতে যে সবচেয়ে বড়লোক সেই পাড়ার অধিপতি। যতই অন্যায়ই করুক না কেন পাড়ার ছেলেরা মোটা চাঁদার লেভে, কলেজে ভর্তি ও চাকরি জোটাবার ক্ষেত্রে সুপারিশের লোভে তাকে পূজা কমিটির president, রবীন্দ্রজয়ন্তীর প্রধান অতিথির আসনে বসায়।

সমাজজীবনে যেমন capital is the master society তেমনি পারিবারিক জীবনেও money is the becoming the guardia of every society, বাবা ততক্ষণই head of the family যতক্ষণ বাবা রোজগার করেন। ছেলেরাও ভাবে বাবার হোটেলে যখন খাচ্ছি তখন বাবার কথা তো শুনতে হবে। আবার যখন বাবা-মাকে ছেলের রোজগারে খেতে হয়, তখন ছেলে এবং ছেলের বৌ-ই নিজ নিজ ক্ষেত্রে virtually head of the family হয়ে দাঁড়ায়। শত অন্যায় করলেও বাবা-মা তাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কোন প্রতিবাদ জানাতে ভরসা পায় না। একসময় আমাদের সমাজে মাতৃত্ব সবচেয়ে গৌরবজনক সম্পদ ছিল-একে নিয়ে কত কবিতা প্রচলিত আছে। কিন্তু আজ সে মাতৃত্বের কি পরিণতি! অন্য আলোচনা নয়-একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। একটি ছেলে কিছুদিন আগে খুব দুঃখ করে বলছিল, তার মা আর তাকে আগের মতো ভালবাসে না। খাওয়া-দাওয়ায়, রোগে-শোকে, সব ব্যাপারে তার চেয়েও তার দাদাকে মা বেশি সেবা যত্ন করে। একদিন দুঃখ করে মা-কে কথাটা বলতেই মা জবাব দিলেন, ' তুই রোজগার করলে তোকেও দাদার মত ভালবাসব'। এ যেন, কতটা মায়ের ভালবাসা পাবে তাও টাকা পয়সা দিয়ে ঠিক হবে। মাতৃস্নেহও যেন আজ বাজারের পণ্য হয়ে গেছে। শুধু মাতৃত্বই নয়, পিতৃত্বেরও একই পরিণতি। মধ্য কলকাতার যে অঞ্চলে আমি থাকি সেখানে শুনেছি বেকার বাবা মেয়েকে প্রতি সন্ধ্যায় সাজিয়ে দেয় দেহ বিক্রি করার জন্য। সেই টাকায় সংসার চলে। father-এর actionকে justify করার জন্য কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু আমরা এরপরও কি ভাবব না-কোন সামাজিক ব্যবস্থা পিতৃত্বকে, মাতৃত্বকে এই অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিয়েছে? বাবা-মা'র হিসাবের বাইরে কোন ছেলে সামাজিক আন্দোলনে এর প্রশ্ন তোলে, ' তোদের খাইয়েছি পড়িয়েছি এইজন্য?' এ যেন investment, return চাই। প্রেম দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রেও একই শোচনীয় অবস্থা। প্রেম করব হিসাব করে degree চাকরি bank balance দেখে। 'দূর, ও চালচুলো নেই, টাকাপয়সা নেই, ওকে আবার ভালবাসবো? চরিত্রের গুণে নয়, ভালবাসার ক্ষেত্রে modern girl দের এটাই একমাত্র বিচারের মাপকাঠি। দাম্পত্য জীবনেও শান্তি নেই। কত ভালবাসেবাসে তা শাড়িতে, গহনায়, সিনেমায়, গাড়িতে, বাড়িতেই নির্ণীত হয়। আমার এসব কথা বলবার উদ্দেশ্য এই নয় যে, সব পরিবার, সব জীবনেই এই জিনিস হয়ে গেছে। আমি শুধু সমাজে কি ঘটছে বা কি ঘটতে যাচ্ছে কেবল সেটাই দেখবার চেষ্টা করলাম। এবার আপনারাই বলুন সব বুঝেও এই আনন্দের জন্যই কি আমরা সমাজ প্রগতির আন্দোলন থেকে পালিয়ে আসব-নাকি যে সমাজ তিলে তিলে আমাদের ধ্বংস করছে, যেখানে মাতৃত্ব-পিতৃত্ব আজ ধূলায় লুণ্ঠিত, যেখানে জীবনের কোন guarantee নেই, যে সমাজে ক্ষুধার্ত সন্তানের ক্রন্দন ধ্বনিতে পাগল হয়ে ব্যর্থ পিতা সেই সন্তানকে ফুটপাতে আছড়ে মারতে বাধ্য হয়, সে সমাজকে ভেঙে আমরা নতুন সমাজ গড়ে তুলবো? যদিও আমি জানি, এই নতুন সমাজ গড়ার কাজে এগিয়ে আসতে হলে অনেকেই বলবেন, এসব রাজনীতি হচ্ছে, এসব রাজনীতির মধ্যে তোমরা যাবে কেন? বলবে ধুরন্ধর রাজনীতিবিদরা। যারা চায়না বিপ্লবী রাজনীতির মধ্যে ছাত্ররা আসুক, তারা এসব কথা বোঝাবে আপনাদের। বলবেন কিছু বিভ্রান্ত শিক্ষকও, বলবেন সংকট জর্জরিত কিছু অভিভাবকও। বাড়িতে বাপ-মা বলবে, ' তোদের এত কষ্ট করে শেখাচ্ছি, পড়াচ্ছি, তোরা শেষ পর্যন্ত রাজনীতিতে নামলি। তাহলে আমাদের কে দেখবে? আমাদের কি হবে? ভাবাবে আপনাদেরও এই কথা। আমি জানি, আপনাদের পিছনেও অনেক বাপ-মা আছেন যাঁরা কষ্ট করে আপনাদের স্কুলে পাঠিয়েছেন। অভাবগ্রস্ত পরিবার, হয়তো এই মুহূর্তে কত মা দুঃখ করছে,

ঠাকুরের কাছে প্রণাম করছে, প্রার্থনা জানাচ্ছে, ছেলেটা পাশটাশ করুক, একটা চাকরি-বাকরি জুটুক, যদি ভবিষ্যতে দুমুঠো অন্ন মেলে। স্বামী শয্যাশায়ী, ছোট ছেলে মেয়েরা কাঁদছে, এমন মায়ের চোখের জল আপনাদের পিছনে আছে। ফলে একদিকে দেশের আহবান, কর্তব্যের আহবান, সমাজের আহবান আর দিকে বাপ-মায়ের চোখের জল। এই সমস্ত প্রশ্ন আপনাদের সামনে আসবে। কিন্তু তবু আমি ভেবে দেখতে বলব, আজকে দেশ, সমাজ, গোটা জাতি, সভ্যতা আপনাদের সামনে নতুন যে কর্তব্য উপস্থিত করেছে তাকে কি আপনারা বাপ-মায়ের চোখের জল, ব্যক্তিগত নানান সমস্যা এসব ভেবে উপেক্ষা করতে পারেন? চোখের জল তো ক্ষুদিরামের পিছনেও ছিল, ছিল সুভাষ বোসের পিছনে। সুভাষ বোসের বাপ-মা কাঁদেননি? প্রশ্ন তোলেননি? বিলেতে পাঠিয়েছিলেন, চেয়েছিলেন ছেলে আই সি এস হবে। সেই সুভাষ বোস আই সি এস ডিগ্রী ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে দু'পায়ে মাড়িয়ে বেরিয়ে এলেন। বাপ-মা সেদিন দুঃখ করে ছিলেন, 'এত কষ্ট করে পাঠালাম ও পাশও করল, আর এখন কি পাগলামি করছে।' কিন্তু ইতিহাসে সুভাষ বোস কি এজন্য অপরাধী? এই প্রশ্ন বিবেকানন্দের মা-ও তুলে ছিলেন, ইতিহাসে বিবেকানন্দ তার জন্য অপরাধী? এই প্রশ্ন বুদ্ধের পরিবারে সুদূর অতীতে হাজার বছর আগে, বাবা,মা,স্ত্রী, সন্তান সকলে তুলেছিলেন। চৈতন্যের জীবনেও এসেছিল। চৈতন্যের মায়ের কান্না কীর্তনে শুনলে এখনও চোখ দিয়ে জল আসে। বহু বড় মানুষের জীবনে এসব এসেছিল। তাঁরা বড় এইজন্য যে, সমস্ত চোখের জলকে অতিক্রম করে তাঁরা বড় আদর্শের ডাকে, সভ্যতার আহবানে সাড়া দিয়েছিলেন। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, ষ্ট্যালিন, মাও সে তুঙ সকলকেই এভাবে আসতে হয়েছে। আমাদের নেতা শিবদাস ঘোষ যখন চৌদ্দ বছর বয়সে ঘর ছেড়েছিলেন তখন তাঁরও পিছনে ছিল অভাবগ্রস্ত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অসহায় পিতামাতার চোখের জল। সেই সময় তিনি যে উক্তি করেছিলেন তা সবসময়ই আমাদের পথ দেখাবে, প্রেরণা দেবে। তিনি বলেছিলেন, ' কোটি কোটি বাপ-মা ঘরে ঘরে, পথেঘাটে কাঁদছে, আমি সকলেরই সন্তান, সকলের চোখের জল মোছানই আমাদের কাজ। ' এইখানেই আমাদের সকলকে এগিয়ে চলবার উত্তর খুঁজতে হবে।

পিতৃত্বের, মাতৃত্বের, ভালবাসার মূল্য নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু কোন ভালবাসার মূল্য দেব? যে ভালবাসা মানুষকে বড় হতে শেখায়, সমাজ ও সভ্যতাকে ভালবাসতে শেখায়, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্বস্ব পণ করে লড়তে শেখায়। সেই ভালবাসাই তো যথার্থ কল্যাণকর। কিন্তু যে ভালবাসা মানুষকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, পারিবারিক জীবনের তুচ্ছ প্রয়োজনে শৃংখলে বাঁধে, আদর্শহীন, রুচিবিগর্হিত আত্মসর্বস্বতার পঙ্কে নিমজ্জিত করে, সে ভালবাসা অকল্যাণকর, সে ভলবাসা ভাল নয়। সে মানুষকে গোলামী করতে শেখায়, অমানুষ করে। তাই সুভাষ বোসের বাবা-মা সুভাষ বোসকে যা দিতে পারেনি, বিবেকানন্দ, দেশবন্ধুর আহবান তাই দিয়েছে। এঁরাই যথার্থ নেতাজীর প্রতি পিতৃত্বের দায়িত্ব পালন করছেন। তেমনি আজকের দিনে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষে যিনি আমাদের মর্যাদাময় বিপ্লবি জীবনের সন্ধান দিয়েছেন, উন্নত রুচি-সংস্কৃতির উজ্জ্বল পথ দেখিয়েছেন, তিনিই আমাদের প্রতি পিতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমরা নিশ্চয়ই চোখের জলের মূল্য দেব। কিন্তু কোন চোখের জলের মূল্য দেব? যে চোখর জল শুধু বাঁধার জন্য কাঁদে, যে চোখের জল আদর্শচ্যুত করে, কর্তব্যভ্রষ্ট করে, গ্লানিময় জীবনের দিকে ঠেলে, আমরা নিশ্চয়ই সেই চোখের মূল্য দেব না। আমরা মূল্য দেব সেই চোখের জলের, যে

চোখের জল সব্যতার জন্য কাঁদে, নিপীড়িত মানুষের জন্য কাঁদে, সেই চোখের জল বুদ্ধ, যীশু, মুহম্মদের চোখের জল ; রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্রের চোখের জল ; মার্কস, লেনিন, কমরেড শিবদাস ঘোষের চোখের জল।

সবশেষে আর একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। প্রত্যেক যুগেই যেমনি সমাজব্যবস্থা তেমনি তার উপযোগি মানুষ তৈরির জন্য সামাজিক শিক্ষা পরিচারিত হয়। এই শিক্ষার মাধ্যমে প্রচলিত সমাজ প্রত্যেককে কতকগুলি values of life দৃষ্টিভঙ্গি শেখায়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তার শাসনের প্রয়োজনে এই values of life ও দৃষ্টিভঙ্গি শেখায়, তা না হলে শুধু লাঠির জোরে বেশিদিন শাসন রাখা যায় না। সেই জন্য সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে এইসব values of life ও outlook পাল্টে যায়। দাস প্রথার যুগে দাস প্রভুদের স্বার্থে জনসাধারণের মধ্যে দাস মনেবৃত্তি সৃষ্টি করা হত এবং এই প্রভু ও দাসের মনোভাব, দাস প্রভু ও দাস সম্পর্ক ছাড়াও নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে পিতা ও সন্তানের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ছিল। সে যুগে যাঁরা দাসপ্রথা বিরোধী মুক্তি আন্দোলন করেছেন তাঁরাও ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে দাস মনোভাব বিরোধী পাল্টা শিক্ষা প্রচার করে গেছেন। আর এটা করতে গিয়েই দাসপ্রভুদের হাতে যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন। ধর্মের শাসনের ভিত্তিতে গড়া রাজতন্ত্র যে absolute শাসনের প্রবর্তন করেছিল, তার প্রয়োজনেই চিন্তা ও সকল সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সেই দিন একই absolute মনোভাবের শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। ধর্ম প্রচারক ও ভক্তদের সম্পর্ক, রাজা ও প্রজার সম্পর্ক হতে শুরু করে নর ও নারীর relation পিতা ও সন্তানের থেকে শুরু করে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক, সর্বত্রই এই absolute relation-এর মনোভাব ছিল। এই রাজতন্ত্রের absolute শাসনের বিরুদ্ধে যাঁরা ব্যক্তির স্বাধীনতা ও মানবতাবাদের ভিত্তিতে মানুষকে সংঘবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, সেই রেনেসাঁর উদগাতাদেরও পাল্টা শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে সামন্ততন্ত্রের হাতে নানাভাবে লাঞ্চিত হতে হয়েছিল। তেমনি আজ ব্যক্তি মুনাফার স্বার্থে পরিচালিত পুঁজিবাদী সমাজ, তার স্বার্থেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও আত্মসর্বস্বতার মনোভাব গড়ে তুলতে চাইছে, সেই উদ্দেশ্যেই সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করছে। যখন পুঁজিবাদ সামন্তবাদকে উচ্ছেদ করতে চাইছিল তখন absolutism-কে ভাঙার জন্য স্লোগান তুলেছিল `what is reasonable is truth পুঁজিবাদের প্রথম যুগে অসংখ্য ক্ষুদ্র পুঁজিপতি ছিল, তাদের বিকাশের প্রয়োজনেই গণতান্ত্রিক অধিকারও অনেক ব্যাপক ছিল। পুঁজিবাদী শোষণও তখন এত নির্মম রুপ ধারণ করেনি। ফলে পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলনও আজকের মত এত মারাত্মকভাবে আসেনি – ফলে তাকে দমনের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার ক্রমাগত খর্ব করার প্রয়োজনও এতটা দেখা দেয় নি। কিন্তু আজ দেশে পুঁজিবাদের বিকাশের পথেই একচেটিয়া পুঁজিবাদ এসেছে, ফলে গণতান্ত্রিক অধিকার মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মধ্যে কেন্দ্রীভুত থাকার ফলে গণতন্ত্র সংকোচিত হচ্ছে। সেই জন্যই judiciary-এর power curtail করা D.I.R-এর ন্যায় অগণতান্ত্রিক আইন প্রণয়ন করা, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলির গণতন্ত্র হরণ করে ক্রমাগত সরকারি সংস্থায় পরিণত করা এসবই হচ্ছে। তা ছাড়া পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে যাতে অত্যাচারিত মানুষ যুক্তি বিজ্ঞানের সাহায্যে পরিচালিত না হয় সেজন্য মানুষের মনকে ক্রমাগত যুক্তি বিরোধী অদৃষ্টবাদ ও শাশ্বতবাদের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। বিজ্ঞানকে একবারে অস্বীকার করার উপায় নেই, তা হলে শিল্প চলবে না, পুঁজিপতিদের মুনাফাও চলবে না। কিন্তু খুব সতর্ক, বিজ্ঞান যাতে মানুষের

চিন্তাক্ষেত্রে না আসে। সেজন্য প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী নেহেরু থেকে শুরু করে বর্তমান রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ পর্যন্ত প্রত্যেকেই প্রচার করে যাচ্ছেন; বিজ্ঞান শুধু technical development-এর জন্য, কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে spiritualism এর দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। অথচ scientific reason যদি না থাকে তবে democracy থাকলেও তা operate করতে পারে না। রাজনীতির ক্ষেত্রে যেভাবে গণতন্ত্রের বদলে ব্যুরোক্র্যাসি মাথা চাড়া দিচ্ছে তেমনি সামাজিক সম্পর্কের সর্বত্র কিভাবে গণতন্ত্রের বদলে বুরোক্র্যাটিক tendency দেখা দিচ্ছে, সেটা আগেই আমি কিছু কিছু দেখিয়েছি।

এই অবস্থায় বর্তমান সমাজকে পাল্টাতে হলে আমাদেরও পাল্টা শিক্ষা প্রচার করতে হবে। স্কুল-কলেজের পাঠ্য তালিকায় কোনো বইয়ে আমাদের এ শিক্ষা খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোনো যুগেই শোষকশ্রেণীই পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থায় সত্যের পথ, শোষণ মুক্তির সংগ্রামের পথ পাওয়া যায় না। তাই যুগে যুগে যারাই বিপ্লবের ঝান্ডা, মানবমুক্তির ঝান্ডা বহন করেছেন তাঁদেরই সে শিক্ষা নিতে হয়েছে সে যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মতাদর্শ থেকে। আজকের এই পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবী সংগ্রামের যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মতবাদ হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা থেকে। আমাদের এখন থেকেই বিপ্লবী জীবনের যথার্থ শিক্ষা ও পথের সন্ধান করতে হবে। Official শিক্ষার বিরুদ্ধে এই ধরনের সভা সমিতি, পত্র-পত্রিকা আলাপ-আলোচনা, বৈঠক এবং সংগ্রামী আন্দোলনের মাধ্যমেই আমরা আমাদের এই সমাজ প্রগতির শিক্ষা প্রচার করে যাচ্ছি। আশা রাখি, এই শিক্ষার দ্বারা দেশের অসংখ্য যুবক-যুবতীদের উদ্বুদ্ধ করে বর্তমান জরাজীর্ন পচা সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে একদিন নুতন সমাজ ও নুতন শিক্ষজীবন গড়ে তুলতে পারবো। এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং এই আশা করছি, যদি কোথাও কোনও সত্য বলে থাকি তাহলে আমাদের এই আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থন পাবো। প্রতি বৎসর ২৮শে ডিসেম্বর আপনাদের সক্রিয় সমর্থন, সাহায্য, নুতন শক্তি ও উদ্দিপনা নিয়ে আমাদের মধ্যে ফিরে আসুক।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ

সারা ভারত ডিএস ও জিন্দাবাদ

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা)
ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত। যোগাযোগ : ৯৫৭৬৩৭৩, মোবাইল : ০১৯১২০০২৩১৯
E-mail: studentfront1984@gmail.com, মূল্য : ১০ টাকা